আল ইরশাদ-সহীহ আকীদার দিশারী

বিভাগ/অধ্যায়ঃ তৃতীয় অনুচ্ছেদ توحيد الأسماء والصفات - তাওহীদুল আসমা ওয়াছ ছিফাত

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ শাইখ ড. ছলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান

আল্লাহ তা‘আলার অতি সুন্দর নাম ও সুউচ্চ গুণাবলী সম্পর্কিত তাওহীদ

ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে যে, তাওহীদ তিন প্রকার:

(১) তাওহীদুর রুবুবীয়া,

(২) তাওহীদুল উলুহীয়া এবং

(৩) তাওহীদুল আসমা ওয়াছ ছিফাত।

উপরোক্ত তিন প্রকার তাওহীদের মধ্য থেকে প্রথম দুই প্রকারের আলোচনা আমরা ইতিপূর্বে করেছি। তাওহীদুর রুবুবীয়া ও তাওহীদুল উলুহীয়া সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এ দুই প্রকার তাওহীদের প্রত্যেক প্রকারকেই বনী আদমের কোনো কোনো সম্প্রদায় অস্বীকার করেছে।

নাস্তিকরা তাওহীদুর রুবুবীয়াকে অস্বীকার করেছে। মূলত তারা আল্লাহ তা‘আলার অস্তিত্বকেই অস্বীকার করেছে। যেমন বস্তুবাদী ও ধর্মত্যাগীরা স্রষ্টার অস্তিত্বকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেছে। আমাদের বর্তমান সময়ে সাম্যবাদীরাও তাদের অন্তর্ভুক্ত। যদিও তারা কেবল বাহ্যিকভাবেই অহংকার বশত অস্বীকার করেছে। অন্যথায় তারা গোপনে এবং মনের গহীনে স্রষ্টার অস্তিত্বকে স্বীকার করে থাকে। কেননা স্রষ্টা ব্যতীত সৃষ্টির অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকা অকল্পনীয়।

তাওহীদের দ্বিতীয় প্রকার হলো তাওহীদুল উলুহীয়া। অধিকাংশ সৃষ্টিই এটিকে অস্বীকার করেছে। এ প্রকার তাওহীদের দাওয়াত দেয়ার জন্য আল্লাহ তা‘আলা নবী-রসূলদেরকে পাঠিয়েছেন। প্রাচীন ও বর্তমানকালের মুশরিকরা এই প্রকার তাওহীদকে অস্বীকার করেছে। গাছ, পাথর, মূর্তি, কবর, সমাধি এবং সুফী শাইখদের ইবাদতের মাধ্যমে তাদের তাওহীদুল উলুহীয়া অস্বীকারের বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়েছে। এক শ্রেণীর নামধারী মিথ্যুক মুসলিম বিশ্বাস করে যে, সুফীদের শাইখরা আল্লাহর পরিবর্তে মানুষের উপকার করার ক্ষমতা রাখে।

তৃতীয় প্রকার তাওহীদ হচ্ছে তাওহীদুল আসমা ওয়াছ ছিফাত। আল্লাহ তা‘আলা তার নিজের সত্তার জন্য অথবা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার রবের জন্য পূর্ণতার যেসব গুণাবলী সাব্যস্ত করেছেন, তা সাব্যস্ত করা এবং আল্লাহ তা‘আলা তার নিজের সত্তা থেকে অথবা তার রসূল তার থেকে অপূর্ণতার যেসব দোষ-ত্রুটি নাকোচ করেছেন, তা নাকোচ করাকে তাওহীদুল আসমা ওয়াছ ছিফাত বলা হয়। পূর্ণতার ছিফাতগুলো সাব্যস্ত এবং অপূর্ণতার ছিফাতগুলো নাকোচ করার ক্ষেত্রে তাদের মূলনীতি হলো, যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡءٞۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡبَصِيرُ﴾

‘‘তার সদৃশ কোনো কিছুই নেই। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা’’।[1] (সূরা শুরা: ১১)

জাহমীয়া সম্প্রদায় এবং তাদের অনুসরণকারী মু‘তাযিলা ও আশায়েরাগণ এ প্রকার তাওহীদ অস্বীকার করেছে।

তাওহীদুল আসমা ওয়াছ ছিফাত তাওহীদুর রুবুবীয়াতেরই অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এর অস্বীকার কারীর সংখ্যা বেড়ে যাওয়া এবং এ সম্পর্কে প্রচুর সন্দেহ ছড়ানোর কারণে স্বতন্ত্র একটি প্রকার সিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছে। এ সম্পর্কে অনেক কিতাবও লেখা হয়েছে।

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ তার প্রসিদ্ধ একটি কিতাবে জাহমীয়াদের প্রতিবাদ করেছেন। তার ছেলে আব্দুল্লাহ ইবনে আহমাদ আস্ সুন্নাহ’ নামে একটি কিতাব রচনা করেছেন, আব্দুল আযীয আলকিনানী লিখেছেন, الحيدة في الرد على بشر المريسي নামে একটি কিতাব, আবু আব্দুল্লাহ আলমিরওয়াযী লিখেছেন, السنة নামে একটি কিতাব, উছমান ইবনে সাঈদ আদ্দারামী লিখেছেন, الرد على بشر المريسي নামে একটি কিতাব এবং এ ব্যাপারে সকল ইমামের সরদার মুহাম্মাদ ইবনে খুযায়মা লিখেছেন التوحيد নামে একটি কিতাব। উপরোক্ত ইমামগণ ছাড়াও শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া এবং তার সুযোগ্য ছাত্র ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ জাহমীয়াদের প্রতিবাদে কিতাব রচনা করেছেন। এসব ইমাম এবং তাদের পরবর্তীতে আগমনকারী ইমামগণ পূর্ববর্তী ইমামগণের পথ অবলম্বন করেছেন। সত্য সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হওয়া এবং বাতিল পরাভূত হওয়ার জন্য আল্লাহর প্রশংসা করছি।

কতিপয় আরব মুশরিকদের থেকে সর্বপ্রথম আল্লাহর ছিফাত অস্বীকার করার বিষয়টি জানা যায়। তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলা এ আয়াতটি নাযিল করেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ﴾

‘‘এভাবে আমি তোমাকে পাঠিয়েছি এমন এক জাতির প্রতি, যার পূর্বে বহু জাতি গত হয়েছে। যাতে আমি তোমার প্রতি যা প্রত্যাদেশ করেছি, তাদের নিকট তা পাঠ করতে পারো। তারা রাহমানকে তথা পরম দয়াময়কে অস্বীকার করে। বলোঃ তিনিই আমার প্রতিপালক। তিনি ব্যতীত অন্য কোনো সত্য উপাস্য নেই। আমি তার উপরই ভরসা করেছি এবং তার দিকেই আমার প্রত্যাবর্তন’’। (সূরা আর রা’দ: ৩০)

এ আয়াতটি নাযিল হওয়ার কারণ হলো কুরাইশরা যখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ তা‘আলার الرحمن নাম উচ্চারণ করতে শুনলো, তখন তারা সেটাকে অস্বীকার করলো। তাদের জবাবে আল্লাহ তা‘আলা এ আয়াত নাযিল করেছেন,

﴿وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ﴾

‘‘এবং তারা রহমানকে অস্বীকার করে’’ (সূরা আর রা‘দ ১৩:৩০)।

ইমাম ইবনে জারীর উল্লেখ করেছেন যে, এটি ছিল হুদায়বিয়ার ঘটনা। হুদায়বিয়ার সন্ধির লেখক যখন بسم الله الرحمن الرحيم লিখলেন, তখন কুরাইশরা বললো, আমরা রাহমানকে চিনি না’’।

ইমাম ইবনে জারীর আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে আরো বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সিজদায় يا رحمن এবং يا رحيم বলে দু‘আ করতেন। মুশরিকরা এতে বলতে লাগলো, মুহাম্মাদ বলে যে, সে মাত্র এক মাবুদকে ডাকে। অথচ দেখছি সে দুই মাবুদকেই ডাকে। তখন আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿قُلْ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾

‘‘বলো, তোমরা আল্লাহ্কে ‘আল্লাহ’ নামে আহবান করো কিংবা ‘রাহমান’ নামে আহবান করো, তোমরা যে নামেই আহবান করো না কেন, তার রয়েছে অনেক অতি সুন্দর নাম’’। (সূরা বানী ইসরাঈল: ১১০) আল্লাহ তা‘আলা সূরা ফুরকানে বলেন,

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ﴾

‘‘তোমরা যখন রাহমান বা পরম দয়াময়ের নামে সিজদাবনত হও, তখন ওরা বলে, রাহমান আবার কে?। (সূরা আল ফুরকান: ৬০)

সুতরাং আল্লাহ তা‘আলার অতি সুন্দর নাম ও সুমহান গুণাবলী অস্বীকার করার ক্ষেত্রে মুশরেকরাই জাহমীয়া এবং আশায়েরাদের উস্তাদ। নিকৃষ্ট ছাত্রদের নিকৃষ্ট উস্তাদ।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا﴾

‘‘তবে কি তোমরা আমার পরিবর্তে তাকে ও তার বংশধরকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করবে? অথচ তারা তোমাদের শত্রু? বড়ই খারাপ বিনিময় যালেমরা গ্রহণ করছে! (সূরা কাহাফ: ৫০)

আর নবী-রসূলগণ এবং তাদের অনুসারীগণ বিশেষ করে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার সম্মানিত সাহাবীগণ ও উত্তমভাবে তাদের অনুসারীগণ আল্লাহ তা‘আলাকে ঐসব গুণে গুণান্বিত করেছেন, যা দিয়ে স্বয়ং আল্লাহ তা‘আলা নিজেকে গুণান্বিত করেছেন এবং তার থেকে ঐসব দোষ-ক্রটি নাকোচ করেছেন, যা স্বয়ং আল্লাহ তা‘আলা নিজের সত্তা থেকে নাকোচ করেছেন। সেই সঙ্গে যারা এ মানহাজের বিরোধিতা করে তারা তাদেরও প্রতিবাদ করেছেন।

আব্দুর রাজ্জাক মা’মার থেকে, মা’মার তাউস থেকে, তাউস তার পিতা থেকে, তার পিতা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি দেখলেন একজন লোক আল্লাহর ছিফাত সংক্রান্ত একটি হাদীছ শুনে কেঁপে উঠছে। সে এটিকে অপছন্দ করেই কেঁপে উঠছিল। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তখন বললেন, এরা আল্লাহ তা‘আলাকে কেমন ভয় করে? কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াত শুনে নরম হয়। আর যখন কোনো অস্পষ্ট আয়াত শুনে তখন ধ্বংস হয় এবং তা অস্বীকার করে?’’

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর মজলিসে যেসব সাধারণ লোক উপস্থিত হতো, এখানে তিনি তাদের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। তারা যখন আল্লাহর ছিফাত সংক্রান্ত কোনো মুহকাম আয়াত শুনতো তখন তারা ভয় করতো এবং তারা আল্লাহর ছিফাতসমূহকে অস্বীকারকারীদের মতো কেঁপে উঠতো। তারা ঐসব লোকদের মতো যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾

‘‘যাদের মনে বক্রতা আছে তারা ফিতনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সবসময় মুতাশাবিহার পিছনে লেগে থাকে এবং তার অর্থ করার চেষ্টা করে। অথচ সেগুলোর আসল অর্থ আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ জানে না। অপর পক্ষে পরিপক্ক জ্ঞানের

অধিকারীরা বলেঃ আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি, এসব আমাদের রবের পক্ষ থেকেই এসেছে। আর প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানবান লোকেরাই শিক্ষা গ্রহণ করে’’। (সূরা আলে-ইমরান: ৭)

সুতরাং বাঁকা অন্তর বিশিষ্ট লোকেরা মুহকাম আয়াতগুলো বাদ দিয়ে মুতাশাবিহাতের পিছনে লেগে থাকে এবং তারা কিতাবের কিছু অংশে বিশ্বাস করে এবং অপর অংশ অস্বীকার করে।

আর আল্লাহর ছিফাত সংক্রান্ত আয়াতগুলো মুহকামাতের অন্তর্ভুক্ত, মুতাশাবিহাতের অন্তর্ভুক্ত নয়। উম্মতের প্রথম সারির আনসার ও মুহাজির মুসলিমগণ, উত্তমভাবে তাদের অনুসরণকারী তাবেঈগণ এবং তাদের পরবর্তীকালের মুজতাহিদ ইমামগণ তা পড়েছেন এবং তার অর্থ বুঝেছেন। তারা এগুলোর প্রতিবাদ করেননি। বর্তমানেও উম্মতের বিজ্ঞ আলেমগণ তা পড়ছেন, অনুধাবন করছেন এবং তা অন্যদেরকে পড়াচ্ছেন। এগুলো বুঝতে তাদের কোনো অসুবিধা হচ্ছে না।

সুপ্রসিদ্ধ ইমাম অকী বলেন, আমরা আ’মাশ এবং সুফিয়ান রাহিমাহুল্লাহকে পেয়েছি যে, তারা আল্লাহ তা‘আলার ছিফাত সংক্রান্ত হাদীছগুলো বর্ণনা করতেন। তারা এগুলো বর্ণনা করাকে অপছন্দ করতেন না কিংবা এগুলোর প্রতিবাদ করতেন না।

বিদআতী মু‘তাযিলা, জাহমীয়া এবং আশায়েরা সম্প্রদায়ের লোকেরাই কেবল ছিফাত সংক্রান্ত হাদীছগুলো অস্বীকার করে। এ ক্ষেত্রে তারা কুরাইশদের ঐসব মুশরিকদের পথ অনুসরণ করেছে, যারা আল্লাহ তা‘আলার রাহমান নামকে অস্বীকার করেছিল এবং আল্লাহ তা‘আলার নামের বিকৃতি ঘটিয়েছিল।

আল্লাহ তা‘আলা সূরা আরাফের ১৮০ নং আয়াতে বলেন,

﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

‘‘আল্লাহ তা‘আলার অনেকগুলো অতি সুন্দর নাম রয়েছে। সুতরাং তাকে সে নামেই ডাকো এবং তার নামসমূহের মধ্যে যারা বিকৃতি করে, তোমরা তাদেরকে বর্জন করো। তারা যা করে আসছে, তার ফল তারা অবশ্যই পাবে’’।[2]

আল্লাহ তা‘আলা এখানে নিজের জন্য অতি সুন্দর নাম সাব্যস্ত করেছেন এবং সেটার মাধ্যমে তাকে ডাকার আদেশ দিয়েছেন। এদের ধারণা মোতাবেক আল্লাহ তা‘আলার যদি নামই না থাকে এবং নামগুলোর অর্থ বোধগম্য না হয় তাহলে তাকে কিভাবে ডাকা হবে? আল্লাহ তা‘আলার নামের মধ্যে যারা বিকৃতি করে এবং তার নামগুলোকে নাকোচ করে অথবা সেটার সঠিক অর্থ বাদ দিয়ে এভাবে ব্যাখ্যা করে যে, শাস্তি ও আযাবের মাধ্যমে তিনি তাদের আমলের বদলা দিবেন। আল্লাহ তা‘আলার বাণী

﴿وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ﴾

‘‘এবং তারা রহমানকে অস্বীকার করে’’ (সূরা আর রা‘দ ১৩:৩০)।

এর মধ্যে আল্লাহ তা‘আলা মক্কার কুরাইশদেরকে কাফের বলে আখ্যায়িত করেছেন। কারণ তারা আল্লাহ তা‘আলার রাহমান নামকে অস্বীকার করেছিল। এ জন্যই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের অনেক আলেম জাহমীয়াদেরকে কাফের বলেছেন।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

ولقد تقلد كفرهم خمسون في ... عشر من العلماء في البلدان
واللالكائي الإمام حكاه عنهم ... بل قد حكاه قبله الطبراني

বিভিন্ন দেশের পাঁচশত আলেম জাহমীয়াদেরকে কাফের বলেছেন এবং তাদের কাফের হওয়ার বিষয়টি সুস্পষ্ট করে উল্লেখ করেছেন। ইমাম লালাকায়ী আলেমদের থেকে তাদের কাফের হওয়ার ফতোয়া উল্লেখ করেছেন এবং তার পূর্বে ইমাম তাবারানীও উল্লেখ করেছেন।[3]

---

[1]. আল্লাহ তা‘আলা বলেন,لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡءٞۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡبَصِيرُ ‘‘তার সদৃশ কোনো কিছুই নেই। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা’’। (সূরা শুরা: ১১) এখানে নাকোচ করা হয়েছে এবং সাব্যস্ত করা হয়েছে। সৃষ্টির মধ্য থেকে কোনো কিছু আল্লাহর সদৃশ হওয়ার ধারণা নাকোচ করা হয়েছে এবং তাঁর জন্য শ্রবণ ও দৃষ্টি সাব্যস্ত করা হয়েছে। আলেমগণ বলেন, আরবদের সুপ্রসিদ্ধ একটি প্রবাদ বাক্য ও মূলনীতি অনুসারে এখানে নফীকে ইছবাতের উপর প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ প্রথমে আল্লাহ তা‘আলা থেকে অপূর্ণতার বিশেষণ ও দোষত্রুটি নাকোচ করা হয়েছে অতঃপর তাঁর জন্য পূর্ণতার গুণাবলী সাব্যস্ত করা হয়েছে। আরবরা বলে থাকে, التخلية تسبق التحلية‘‘সাজসজ্জার পূর্বে পরিস্কার করা আবশ্যক’’। সুতরাং আল্লাহ তা‘আলাকে পূর্ণতার বিশেষণের মাধ্যমে বিশেষিত করার আগে অন্তর থেকে স্রষ্টাকে সৃষ্টির সাথে তুলনা করা কিংবা সৃষ্টির সাথে স্রষ্টাকে তুলনা করার দোষ-ত্রুটি থেকে খালি করা আবশ্যক। অন্তর যখন তাশবীহ ও তামছীলের দোষ থেকে খালি হবে, তখনই আল্লাহ তা‘আলার জন্য শোভনীয় পদ্ধতিতে পূর্ণতার গুণাবলী সাব্যস্ত করা হবে। উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তা‘আলার জন্য দু’টি ছিফাত সাব্যস্ত করা হয়েছে। একটি শ্রবণ এবং অন্যটি দৃষ্টি।

আলেমগণ আরো বলেন, আল্লাহ তা‘আলার ছিফাত সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে উক্ত আয়াতে অন্যান্য ছিফাত বাদ দিয়ে শ্রবণ ও দৃষ্টিকে একসাথে উল্লেখ করার কারণ হলো, শ্রবণ ও দৃষ্টি প্রাণবিশিষ্ট অধিকাংশ সৃষ্টির মধ্যেই রয়েছে। যেসব সৃষ্টির মধ্যে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ার শক্তি থাকার সাথে সাথে প্রাণ বা রূহ আছে, তাদের সবগুলোর মধ্যেই শ্রবণ ও দৃষ্টি শক্তি রয়েছে। মানুষের রয়েছে শ্রবণ ও দৃষ্টি এবং সমস্ত প্রাণীর রয়েছে শ্রবণ ও দৃষ্টি। মাছির রয়েছে তার জন্য শোভনীয় শ্রবণ ও দৃষ্টি। উটের রয়েছে শোভনীয় শ্রবণ ও দৃষ্টি। এমনি সমস্ত পাখি, মাছ, ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী অন্যান্য জীব-জন্তু এবং কীটপতঙ্গের রয়েছে শোভনীয় শ্রবণ ও দৃষ্টি।

আর জ্ঞানীদের কাছে সুস্পষ্ট যে, সমস্ত প্রাণীর শ্রবণ ও দৃষ্টি একরকম নয়। মানুষের শ্রবণ-দৃষ্টি প্রানীর শ্রবণ-দৃষ্টির অনুরূপ নয়। মানুষের শ্রবণ-দৃষ্টি সমস্ত প্রাণীর শ্রবণ-দৃষ্টির চেয়ে পূর্ণতম। তবে মানুষ এবং অন্যান্য সকল প্রাণীর জন্য শ্রবণ ও দৃষ্টি বিশেষণের মূল অংশ যৌথভাবে সাব্যস্ত। তবে প্রত্যেক প্রাণীর জন্য যতটুকু শ্রবণ ও দৃষ্টি প্রয়োজন তার মধ্যে শোভনীয় পদ্ধতিতে কেবল ততটুকুই স্থাপন করা হয়েছে। সুতরাং প্রাণী ও জীব-জন্তুর মধ্যে শ্রবণ ও দৃষ্টি আছে। মানুষের মধ্যেও শ্রবণ-দৃষ্টি আছে। মানুষের মধ্যে শ্রবণ ও দৃষ্টি আছে বলেই তা প্রাণী ও জীব-জন্তুর শ্রবণের মতো নয়।

সুতরাং মহান মালিক, চিরঞ্জীব সত্তা ও সবকিছুর ধারক আল্লাহ তা‘আলার জন্য শ্রবণ ও দৃষ্টি বিশেষণ সাব্যস্ত করলে তা সৃষ্টির গুণের সাদৃশ্য হয়ে যায় কিভাবে!! আসল কথা হলো মহান স্রষ্টার রয়েছে এমন শ্রবণ ও দৃষ্টি, যা তাঁর বড়ত্ব ও মর্যাদার জন্য শোভনীয়। যেমন রয়েছে নগণ্য মাখলুকের জন্য প্রয়োজনীয় ও শোভনীয় শ্রবণ ও দৃষ্টি। আল্লাহ তা‘আলার শ্রবণ ও দৃষ্টি বিশেষণ সকল দিক মূল্যায়নে পূর্ণতম এবং সকল দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত। কিন্তু

কোনো মাখলুকের শ্রবণ ও দৃষ্টি সকল দিক মূল্যায়নে পূর্ণতম নয় এবং তা দোষ-ত্রুটি থেকে একেবারে মুক্তও নয়। আল্লাহ তা‘আলার বাকীসব সিফাতের ক্ষেত্রেও একই কথা। যদিও সকল সিফাতের মূল অংশ আল্লাহ তা‘আলা এবং বান্দার জন্য যৌথভাবে সাব্যস্ত। পার্থক্য হবে শুধু পরিমাণ ও পদ্ধতির ক্ষেত্রে। অর্থাৎ নগণ্য মাখলুকের ছিফাত নগণ্য এবং সেটার অনেক সিফাতের ধরণ আমাদের জানা আছে। আর মহান ও অসীম স্রষ্টার সিফাতের পরিমাণ তাঁর মতোই অসীম এবং তার পদ্ধতিও আমাদের জানা নেই।

সুতরাং মুমিন বান্দাদের উপর আবশ্যক হলো আল্লাহ তা‘আলা তাঁর নিজের সত্তার জন্য পূর্ণতার যেসব গুণাবলী সাব্যস্ত করেছেন কুরআন-সুন্নাহর মূলনীতি ও সালাফে সালেহীনদের মানহাজ অনুযায়ী তা তাঁর পবিত্র সত্তার জন্য সাব্যস্ত করা এবং তিনি তাঁর নিজের সত্তা থেকে যেসব অপূর্ণতা ও দোষ-ত্রুটি নাকোচ করেছেন, তা নাকোচ করা। সেই সঙ্গে আরো বিশ্বাস করা আবশ্যক যে, স্রষ্টার জন্য পূর্ণতার বিশেষণ সাব্যস্ত করলে তা সৃষ্টির সিফাতের মত হয়ে যায় না।

[2]. إلحاد (ইলহাদ) শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে বাঁকা হওয়া, একদিকে ঝুকে পড়া, কোন জিনিস থেকে সরে আসা, ইত্যাদি। এখান থেকেই কবরকে লাহাদ বলা হয়। কবরকে লাহাদ বলার কারণ হলো, সেটাকে খনন করার সময় গর্ত খননের সাধারণ রীতি ও পদ্ধতির ব্যতিক্রম করে কিবলার দিকে বাঁকা করে দেয়া হয়।

আর আল্লাহর অতি সুন্দর নাম, তাঁর সুউচ্চ গুণাবলী এবং আয়াতসমূহের মধ্যে ইলহাদ হচ্ছে সেটার প্রকৃত ও সঠিক অর্থ বাদ দিয়ে বাতিল অর্থের দিকে নিয়ে যাওয়া। আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর মধ্যে ইলহাদ কয়েক প্রকার।

(১) আল্লাহর নামে দেবতার নাম রাখা: আল্লাহর অন্যতম নাম الإله থেকে মুশরেকরা তাদের এক দেবতার নাম রেখেছে اللات (লাত), আল্লাহর নাম العزيز থেকে তারা তাদের আরেক মূর্তির নাম রেখেছে العزى (উয্যা) এবং আল্লাহর নাম المنان থেকে তারা তাদের আরেক বাতিল মাবুদের নাম রেখেছে مناة (মানাত)।

(২) আল্লাহর এমন নাম রাখা, যা তার মর্যাদা ও বড়ত্বের শানে শোভনীয় নয়: যেমন খ্রিষ্টানরা আল্লাহকে أب (FATHER বা পিতা) বলে। দার্শনিকরা আল্লাহকে موجب (আসল সংঘটক) কিংবা علة فاعلة (সক্রিয় কারণ) বলে থাকে।

(৩) আল্লাহকে এমন ত্রুটিযুক্ত বিশেষণে বিশেষিত করা, যা থেকে তিনি নিজেকে পবিত্র রেখেছেন: যেমন অভিশপ্ত ইয়াহূদীরা বলে থাকে ﴿إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ﴾ “নিশ্চয়ই আল্লাহ গরীব আর আমরা ধনী”। তারা আরো বলে,

﴿يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا ۘ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ﴾

“আল্লাহর হাত বাঁধা। আসলে বাঁধা হয়েছে ওদেরই হাত এবং তারা যে কথা বলছে সে জন্য তাদের উপর অভিশাপ বর্ষিত হয়েছে। আল্লাহর দুই হাত সদা প্রসারিত। যেভাবে চান তিনি খরচ করেন”। (সূরা মায়িদা: ৬৪)

তারা আরো বলে থাকে আল্লাহ তা‘আলা ছয়দিনে আসমান-যমীন এবং সেটার মধ্যকার সকল বস্তু সৃষ্টি করার পর শনিবারে বিশ্রাম নিয়েছেন। মূলতঃ আল্লাহ তাদের কথার অনেক উর্ধ্বে।

(৪) আল্লাহ তা‘আলার অতি সুন্দর নাম ও সুউচ্চ ছিফাতগুলোর অর্থ ও হাকীকত অস্বীকার করা: যেমন জাহমীয়ারা বলে আল্লাহর নামগুলো শুধু শব্দের মধ্যেই সীমিত। এগুলো কোনো গুণ বা অর্থকে নিজের মধ্যে শামিল করে না। তারা বলে আল্লাহর অন্যতম নাম হচ্ছে, السميع (সর্বশ্রোতা), কিন্তু এই নামটি প্রমাণ করে না যে, তিনি শুনেন

কিংবা এটি প্রমাণ করে না যে, শ্রবণ করা তাঁর অন্যতম একটি বৈশিষ্ট। আল্লাহর অন্যতম নাম হচ্ছে البصير (সর্বদ্রষ্টা), কিন্তু এই নামটি প্রমাণ করে না যে, তিনি দেখেন কিংবা দেখা তাঁর গুণ এবং আল্লাহ তা‘আলার আরেকটি নাম হচ্ছে الحي (চিরজীবন্ত), কিন্তু ইহা প্রমাণ করে না যে, তাঁর হায়াত বা জীবন আছে। আল্লাহর অন্যান্য নাম ও সিফাতের ক্ষেত্রেও তারা একই রকম কথা বলে থাকে।[2]

(৫) আল্লাহর ছিফাতসমূহকে মাখলুকের সিফাতের সাথে তুলনা করা: যেমন মুশাবেবহা (আল্লাহর ছিফাতকে সৃষ্টির সিফাতের সাথে তুলনাকারী) সম্প্রদায়ের লোকেরা করে থাকে। তারা বলে থাকে, আল্লাহর হাত আমার দুই হাতের মতোই। অন্যান্য সিফাতের বেলাতেও তারা একই রকম কথা বলে। আল্লাহ তাদের এই ধরণের কথার অনেক উর্ধ্বে।

যারা আল্লাহর অতি সুন্দর নাম ও আয়াতের মধ্যে ইলহাদ করে, তাদেরকে তিনি কঠোর আযাবের ধমক দিয়েছেন। আল্লাহ তা‘আলা সূরা আরাফের ১৮০ নং আয়াতে বলেন,

﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ ۚ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

‘‘আল্লাহ তা‘আলার অনেকগুলো সুন্দরতম নাম রয়েছে। সুতরাং তাঁকে সেই নামেই ডাকো এবং তাঁর নামসমূহের মধ্যে যারা বিকৃতি করে, তোমরা তাদেরকে বর্জন করো। তারা যা করে আসছে, তার ফল অবশ্যই তারা পাবে’’। আল্লাহ তা‘আলা সূরা ফুস্সিলাতের ৪০ নং আয়াতে আরো বলেন,

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَفَمَن يُلْقَىٰ فِي النَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾

‘‘যারা আমার আয়াতসমূহের বিকৃতি (উল্টা অর্থ) করে, তারা আমার অগোচরে নয়। যাকে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে সে উত্তম? না যে কিয়ামতের দিন নিরাপদ অবস্থায় হাজির হবে সে উত্তম? তোমরা যা চাও করতে থাকো, আল্লাহ তোমাদের সব কাজ দেখছেন’’।

[3]. ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ তার আকীদা বিষয়ক কাসিদাহ নুনিয়ার মধ্যে এ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এক অধ্যায়ে তিনি বলেছেন যে, জাহমিয়রা মুশরিকদের চেয়েও নিকৃষ্ট। নুনিয়ার অন্য একটি অনুচ্ছেদে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, তাদের বিদআতগুলো কুফুরী পর্যন্ত পৌছে গেছে। নিঃসন্দেহে তাদের আকীদা ও আমলগুলো প্রমাণ করে যে, তারা মুসলিমদের আলেমদের সম্পূর্ণ বিরোধিতা করেছে। তাদের নিকৃষ্ট আকীদার মধ্যে রয়েছে যে, আল্লাহ তা‘আলা কথা বলেন না। আমাদের প্রশ্ন হলো, আল্লাহ তা‘আলা যদি কথা না বলেন, তাহলে কুরআন কার কালাম? জবাবে তারা বলেছে যে, কুরআন হলো অন্যান্য সৃষ্টির মতই একটি সৃষ্টি। যেমন মানুষ এক প্রকার সৃষ্টি। সুতরাং তারা আল্লাহ তা‘আলার কথা বলা বিশেষণ নাকোচ করার মাধ্যমে আল্লাহ তা‘আলার সমস্ত প্রত্যাদেশকে মাখলুক বলেছে।

প্রকৃত কথা হলো কুরআন-হাদীছের বহু দলীল এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের আলেমদের ঐক্যমতে কুরআন মাখলুক নয়; বরং তা আল্লাহর কালাম। আল্লাহ তা‘আলা এর মাধ্যমে কথা বলেছেন। তার থেকেই কুরআন এসেছে এবং তার নিকটই ফিরে যাবে।

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন